Ajker Gangchil Patrika
Volume 2 Issue 6 June–September 2022
RNI Title Code WBBEN 15820
Declaration No. 06/2021 dated 07.03.2020

আজকের গাঙচিল পত্রিকা

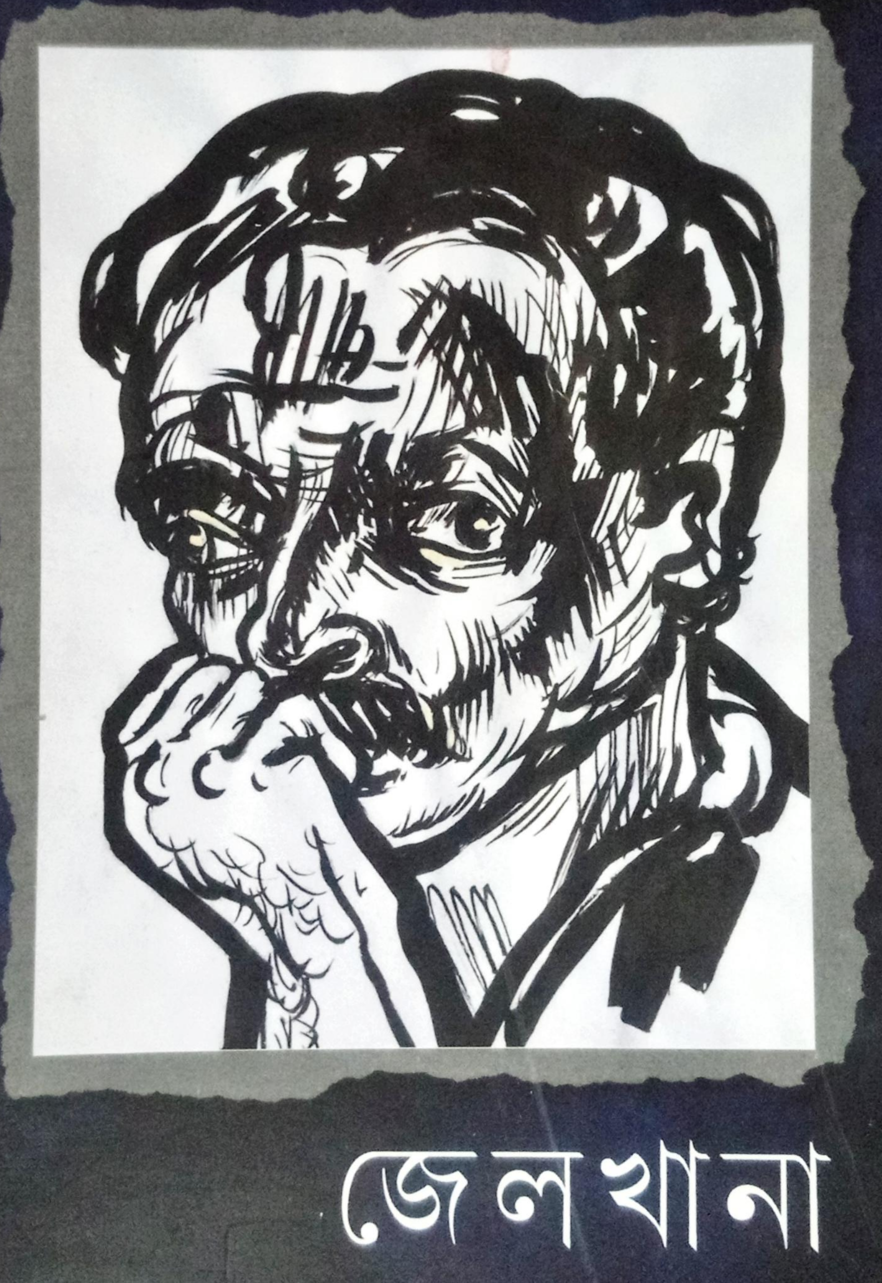

জেলখানা

সূচি

জেলখানা

Volume 2 Issue 6 June—September 2022

সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ/নিবন্ধ
মিশেল ফুকোর জেলখানা।। **চণ্ডী মুখোপাধ্যায়** ৯
কারাগার থেকে সংশোধনাগার ।। **দোয়েল দে** ১৭
হাম্বুরাবি কোডে বিচারককেও আইনের ঊর্ধ্বে রাখা হয়নি ।।
সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ২৮
ঝঞ্ঝাঝড়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।। **মেসবাহউদ্দীন আহমেদ** ৩৮
'জেল খেটে এসেছ, আবার বাইরে কাজ করতে যাচ্ছ!' ।। **বিশাখা নন্দী** ৬৭
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আট বছর: দেখলাম পাঁচিল-ঘেরা ভারতবর্ষ/
রাজারাম চৌধুরীর নিজের কথায়।। **স্বপন মুখোপাধ্যায়** ৮০
জেল থেকে দুটি চিঠি ।। **বিজলীরাজ পাত্র** ৯৬
'বিপজ্জনক'দের জন্য তখন বক্সা ।। **রাজর্ষি বিশ্বাস** ১০২
কবি যখন কয়েদি ।। **অবশেষ দাস** ১১৩
মুঘলবন্দি ।। **গৌতম বিশ্বাস** ১২৬
শেক্সপিয়রের নাটক কী বলে ।। **সায়ন ভট্টাচার্য** ১৩২
মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের জেল ।। **মণীন্দ্র মাইতি** ১৩৭
জেলের ভাত ।। **মলয় মণ্ডল** ১৪৪
যারা পালিয়ে যায় ।। **রবিন মুখোপাধ্যায়** ১৫৪
কারাগারের অ আ ক খ ।। **অরিত্রী দে** ১৬২
ইতিহাস ও বিবর্তনে ত্রিপুরা জেল ।। **জ্যোতির্ময় দাস** ১৭৫

গাঙচিল

২০২১

গাঙচিল

প্রধান কার্যালয়

'মাটির বাড়ি' ওঙ্কার পার্ক

ডাকঘর ঘোলা বাজার কলকাতা ৭০০ ১১১

ফোন ৯৪৩২৪ ০৭৬৬৫; ৯৪৩২৯ ৯১৫৩০

gangchiladhir@gmail.com

ফেসবুক

adhir biswas এবং www.facebook.com/gangchil

বিক্রয়কেন্দ্র

কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (বর্ণপরিচয়, দোতলা) স্টল/সি (পি) ৬ কলকাতা ৭০০ ০০৭

০৩৩ ২২৪১ ০৪০৪ (১–৮টা)

অনলাইন

9432991530, 9432407665 (Gangchil Whatsapp Number)

ReadBengaliBooks.com

আজকের
গাঙচিল পত্রিকা ।।

দোয়েল পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

'জ্ঞান-বিচিত্রা' আগরতলা, ত্রিপুরা

'তক্ষশিলা' আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা/'বাতিঘর' ঢাকা, চট্টগ্রাম

গল্প

আকালের আখ্যান ।। **নিরঞ্জন মণ্ডল** ১৮১

বই পড়া

প্রান্তিক আখ্যানমালা ।। **সাত্যকি হালদার** ১৮৬

শাশ্বতর অভিধান ।। **উপল মুখোপাধ্যায়** ১৮৯

লাস্ট পেজ

সমর্পণ ।। **অধীর বিশ্বাস** ১৯৩

কবি যখন কয়েদি

অবশেষ দাস

জেলে গিয়ে মানুষকে খুঁজে পাওয়ার নেশা জন্মে গিয়েছিল। বাইরের জীবনে সেটা পাইনি। দশ বছর ভেতরে থাকার পর বাড়ি ফিরলাম বটে, কেউ তো খোঁজ নিল না। অনেকে অপরাধীর ছায়া দেখে দূরে সরে গেছে। বাইরে এসে ছেলেমেয়েকে ফিরে পেলাম। সংসারটা নিজের দু'হাতে ছুঁয়ে দেখবার অধিকার পেলাম

নাভির নীচ থেকে বুকের ছাতি পর্যন্ত উনিশ ইঞ্চি ধারালো ছুরি দিয়ে কাটা দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি। সতেরোটা সেলাই একটা একটা করে গোনা যায়। জীবনের তিক্ততম স্মৃতি দগদগে ঘায়ের মতো স্পষ্ট। প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। অথচ, কেস-হিস্ট্রি থেকে সম্পূর্ণ উল্লেখহীন এই উনিশ ইঞ্চি কাটা দাগ। তাঁকে ঘিরে আজও অপরাধের গভীর কুয়াশা ও ধোঁয়াশা ভিড় করে আছে। তিনি আক্ষেপ করেন, আসল সত্যটা যদি ঈশ্বর সবার কাছে বলে দিতে পারতেন। জীবনের মূল্যবান দশটা বছর কেটে গেছে দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে। অনেকে তো সোজাসাপটা বলেন, দশ বছর জেল খাটা আসামি সে। 'সে' বলতে কে? শূন্য দশকের আগে তিনি একটি অসামান্য কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন, 'মানুষের নাম ধরে'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে অত্যন্ত পরিচিত মুখ কবি ও সম্পাদক বিশ্বনাথ মাঝি। তাঁর 'এখন খোলা হাওয়া'(১৯৯১)

পত্রিকা শুরুতে 'খোলা হাওয়া' নামে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে ১৯৯৫ থেকে 'এখন খোলা হাওয়া' নামেই প্রকাশিত হয়েছে নিয়মিত, ২০০৪ সাল পর্যন্ত। সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক। 'এখন খোলা হাওয়া'র সাহিত্য আসরে বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকরা নিয়মিত চাঁদের হাট বসিয়েছেন। সেই সাহিত্য আসর আজও বসে। কিন্তু ২০০৪-এর পর থেকে লিটল ম্যাগাজিন পাড়া থেকে উধাও হয়ে যায় 'এখন খোলা হাওয়া'। উধাও হয়ে যান 'খোলা হাওয়া'র সম্পাদক কবি বিশ্বনাথ মাঝি। তিনি গাইঘাটা বিডিও অফিসের (উত্তর চব্বিশ পরগনা) পঞ্চায়েত সেক্রেটারি। ২০০০ সালের ৩০ মার্চ থেকে ২০০৪ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত তিনি সার্ভিস করেছেন। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তিনি পনেরো দিনের ছুটিতে ছিলেন। কিন্তু অডিটের জন্য তাকে তড়িঘড়ি জয়েন করতে হয়েছিল। ১৭ মার্চ ২০০৪ বুধবার সন্ধ্যায় অফিস থেকে অস্থায়ী বাসভবনে তিনি আরও একটি মর্মান্তিক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। বলা ভাল, তিনি একটি মর্মান্তিক ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। এই ঘটনার সমস্ত দায় এসে পড়ে তার ঘাড়ে। তিনি নিজেই মারাত্মক ভাবে জখম অবস্থায় স্থানীয় পরিচিতদের সহায়তায় ভর্তি হলেন স্থানীয় হাসপাতালে। তার পর পুলিশি তত্ত্বাবধানে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল হয়ে নীলরতন সরকার হাসপাতালে মরণপণ লড়াই করে প্রাণে বাঁচলেন। কিন্তু 'এখন খোলা হাওয়া' অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। তখনও পেটের সেলাই কেটে দেওয়া সম্ভব হয়নি, সপ্তাহখানেক পরেই খুনের আসামি হিসেবে তাকে বনগাঁ আদালতে তোলা হল। তত দিনে সংবাদমাধ্যমে খবর রটে গেছে, মহিলা সহকর্মীকে খুনের দায়ে গাইঘাটার ডুমা পঞ্চায়েত সমিতির সেক্রেটারি বিশ্বনাথ মাঝি গ্রেপ্তার। আদালতেই সংশোধনাগার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার নির্দেশ দেন বিচারপতি। আট বছর বিচারাধীন থাকার পর যাবজ্জীবন সাজা হয়। শেষ পর্যন্ত আইনজীবীর সহায়তায় তিনি জামিনে বাড়ি ফেরেন ২০১২ সালে। তত দিনে জেলের মধ্যে কেটে গেছে নিষ্ঠুর দশটা বছর। এখনও চলছে সে বিচার। বনগাঁ জেলে বেশ কিছু দিন থাকার অভিজ্ঞতা ছাড়া বেশির ভাগ সময় কেটেছে, বজবজ সেন্ট্রাল জেলে। তিনি কবি, সম্পাদক, পঞ্চায়েত সেক্রেটারিই নন শুধু, ঘোরতর সংসারী এবং স্নেহপরায়ণ বাবা। অথচ বিতর্কিত এক ঘটনার একাধারে সাজাপ্রাপ্ত আসামি, আবার অন্য দিকে তিনিই জামিনে মুক্ত হওয়া বিচারাধীন আসামি। সত্যের কুলকিনারা কোথায়, তা বলা যায় না। আততায়ী হিসেবে নয়, একজন কবি হিসেবে তিনি নিজেকে আজও বিছিয়ে রেখেছেন,

নানাভাবে। অসাধারণ ছবিও আঁকেন। দমদম জেলে থাকাকালীন তাঁকে ভেতরের সবাই 'মাস্টারদা' বলে ডাকত। ওটাই তার নাম হয়ে গিয়েছিল। জেলখানায় কেটে যাওয়া দশটা বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক আলোছায়া আছে, চাপ চাপ অন্ধকার আছে। জ্যোৎস্না আছে। আবার ভোরের আলোর মতো কিছু খোলামেলা দিকও আছে। সূর্যোদয়ের গল্প আছে। অপরাধী, আততায়ী পরিচয়কে অতিক্রম করে একজন যথার্থ মানুষ হিসেবে তাঁকে যেন খুঁজে পাওয়া গেল। একজন কবি তো বটেই। সেই জেল-জীবনের নানা অভিজ্ঞতার গল্প তিনি অকপটে শুনিয়ে গেলেন। কোথাও কোথাও বললেন, ওটা লেখা যাবে না। বলা যাবে না। জেলখানার অন্দরমহলের প্রশস্ত বর্ণপরিচয় উঠে এসেছে তাঁর দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাতকারের মাধ্যমে।

অবশেষ: জেলখানা বললে সাধারণ মানুষের কাছে সংশয় ও ভীতি সঞ্চার হয়। তবে বর্তমানে এর পোষাকি নাম হল, সংশোধনাগার। তার পরেও আতঙ্ক বিন্দুমাত্র কমে না। কেমন করে তাকে দেখলেন আর মানিয়ে নিলেন?

কবি বিশ্বনাথ: কিছু করার থাকে না। ওখানে ঢোকার পর বিভিন্ন ধরনের মানুষের মুখোমুখি হতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তারা। অন্যমনস্ক হওয়ার উপায় থাকবে না। অভিযোজন তারাই শিখিয়ে দেবে। মানিয়ে নেওয়া কখনও যায় কি? পরিবেশ ও পরিস্থিতি সবকিছু বাধ্য করে। আমার জীবনে পরম করুণাময়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল ওই জেলজীবনে। সবই কেমন ঠিকঠাক কেটে গেছে।

অবশেষ: জেলের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিষয়টা কেমন গোলমেলে না? তাঁর আশীর্বাদই থাকবে তো জেলের মধ্যে দিন কাটবে কেন?

কবি বিশ্বনাথ: হ্যাঁ। আশীর্বাদই বলব। কারণ জেলের বাইরে থাকলে তার চেয়েও খারাপ কিছু হতে পারত। মার্ডার হয়ে যেতাম হয়তো। রামকৃষ্ণের কৃপাধন্য হয়ে জীবনের নতুন পথ আবিষ্কার করেছি, ওই জেলখানায়। মানে সংশোধনাগারে।

অবশেষ: কেমন সে কৃপা? আগে আপনি রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন ছিলেন না?

কবি বিশ্বনাথ: আমি দস্তুরমতো নাস্তিক ছিলাম। মানবধর্ম ছাড়া কোনও ধর্ম নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। দমদম সেন্ট্রাল জেলে (দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার) থাকাকালীন প্রতি বুধবার জেলখানার ক্লাবে বা বিনোদন মঞ্চে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্বামী আত্মস্থানন্দ মহারাজ আসতেন সুদূর মালদহ থেকে। আধ্যাত্মিক

জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তখন থেকে রামকৃষ্ণের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ জন্মায়। একদিন একটা কবিতা পড়েছিলাম। কবিতাটির নাম সাঁকো। আমারই লেখা। মহারাজ প্রতিদিন সবার শেষে কথা বলতেন। জেলের সাজাপ্রাপ্ত বন্দি এবং বিচারাধীন বন্দিরা ওই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দিক তুলে ধরত। মহারাজ সবাইকে উৎসাহিত করতেন। ঈশ্বরের পথ দেখাতেন। আমি যেদিন কবিতাটি পড়লাম, বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমি আজ কী বিষয়ে কথা বলব, ভেবে এসেছিলাম। কিন্তু একটি ছেলে 'সাঁকো' কবিতাটি পাঠ করে গেল। অসাধারণ একটি কবিতা। ফলে আমার বলার কিছু আর নেই। ওই কবিতায় সব বলা আছে। আমি আজ আর কিছু বলব না। কবিতাটি নিয়েই আজ দু'চার কথা বলব।" পরবর্তী কালে ওই কবিতাটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সম্ভবত ২০০৭ সালে। তার পর থেকে মহারাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হল। কোনও বুধবার আমায় দেখতে না পেলেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি তাড়াহুড়ো করে চলে আসতাম। জেলখানার ফার্মাসিতে কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে দেরি হয়ে যেত। বিভিন্ন ধরনের রোগীদের ভিড় থাকত। রোগী মানে, হয় সাজাপ্রাপ্ত, না হয় বিচারাধীন আসামি।

অবশেষ: সিনেমায় আমরা দেখি, জেলের মধ্যে মারপিট, কাটাকাটি, গুন্ডামি থেকে শুরু করে সব কিছু ঘটে। শুধু অশান্তি আর অশান্তি। আপনার অভিজ্ঞতা কেমন? শান্তি বলে কি ওখানে কিছুই নেই?

কবি বিশ্বনাথ: জেলে কোনও অশান্তি নেই। পরিবারকে ছেড়ে থাকার কঠিন কষ্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। জেলে শান্তি আছে। সুব্যবস্থা আছে। বাইরে থেকে কেউ প্রভাব খাটাতে পারে না। সাড়ে তিন মাসের পর আমার বাড়ি থেকে পয়সা দিতে পারেনি। সুপারিনটেন্ডেন্ট সহযোগিতা করেছিলেন। আমাকে মেডিকাল ডায়েটের ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেকের চেয়ে অনেক ভাল থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ওই পরিবেশে যেটুকু হয় আর কি। কারও মশারির ব্যবস্থা ছিল না। আমরা দুজন (বিশ্বনাথ ও শত্রুঘ্নপ্রসাদ কামাট/ দুজনেরই ৩০২ ধারা) মেডিটেশন করতাম। সাহেব আমাদের জন্যে মশারি অ্যালাও করে দিয়েছিলেন।

অবশেষ: বাড়ির থেকে কীসের পয়সা দিতে হত?

কবি বিশ্বনাথ: ভি.আই.পি খাবারের জন্যে টাকা দিতে হয়। প্রত্যেক মাসে দিত হত। কিন্তু একটা সময় আমার বাড়ি থেকে টাকা দেওয়া আর সম্ভব হল না। চিন্তায় ছিলাম, কীভাবে চলবে।

অবশেষ: ভি.আই.পি বিষয়টি বোধগম্য হল না। একটু বলবেন?

কবি বিশ্বনাথ: ওখানে অনেক গোলমেলে বিষয় আছে। শেষের দিকে দেখেছি, সব বদলে গেছে। অনেক ভাল হয়ে গেছে। সব কথা বলতে নেই। জঘন্য খাবারদাবার ছিল। বাড়ির লোকের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করা হত। এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয় যে বাড়ির লোক টাকা দিতে বাধ্য হয়। ঘর থেকে টাকাপয়সা দিয়ে একটু ভাল খাবার বন্দোবস্ত করাটাই ভি.আই.পি খাবার। সেসব দিন এখন আর নেই। জেলখানার এখন আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। খাবারদাবার সব কিছু ভাল। অনেকেই তাই আর বের হতে চায় না। ভেতরের জগতে জীবন কাটাতে চায়।

অবশেষ: জেলখানার দুর্দিন এবং সুদিন সবই আপনি দেখেছেন। আপনি কি তা হলে সন্ধিক্ষণের যাত্রী?

কবি বিশ্বনাথ: তা বলতে পারেন। যথার্থ সন্ধিক্ষণ। ভেতরে যখন ঢুকেছিলাম (২০০৪) তখন জঘন্য দশা ছিল। রুটি এক দিকে পোড়া, এক দিকে কাঁচা। খাওয়ার উপযুক্ত নয়। ডাল-সবজি পাতে দেওয়ার মতো নয়। কাঁকড় মেশানো চাল। কত ভাত যে প্রতিদিন ড্রেনে চলে যেত, তার ঠিক নেই। কুইন্টাল কুইন্টাল চালের ভাত। ড্রেন থেকে ভাত পচে দুর্গন্ধ উঠত। ওই দিকটায় যাওয়া যেত না। ভাত শুধু নয়, ডাল-সবজি সব ফেলা যেত। পরে বেলচা মেরে সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা ওগুলো ড্রেনের ওপর তুলে দিয়ে চাষবাসের সার হিসেবে ব্যবহার করত। এই সময়টা পেরিয়ে গেছে, দমদম সেন্ট্রাল জেলের ভোল বদলে গেল, বিপ্লব দাশগুপ্তের সময় থেকে। তিনি দমদম সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভিআইপি কোটার খাবার বলে কিছু নেই। সিপাহিদের যারা টাকাপয়সা দেবে, তাদের পেছনের চামড়া তুলে দেব। কোনও সিপাইকে যদি টাকা নিতে দেখি তো সঙ্গে সঙ্গেই সাসপেন্ড করে দেব।' সেই যে বদলে গেল, তার রেওয়াজ এখনও চলছে। জেলের অভিশাপের দিন পেরিয়ে গেছে। আশীর্বাদের আলো ফুটেছে। সবাই তো মানুষ। সকলের অধিকার আছে, সুন্দর করে বাঁচবার।

অবশেষ: আপনি একটানা কত দিন ভেতরে ছিলেন? জেলের ভেতরের জীবন আর বাইরের জীবনের মধ্যে ফারাক কী আছে?

কবি বিশ্বনাথ: একটানা দশ বছর ভেতরে ছিলাম। বনগাঁ সাব-জেলে সর্বসাকুল্যে দেড় বছরের মতো ছিলাম। বাকিটা দমদমে। বনগাঁ জেলে ঠাকুরের

যত্নে ছিলাম। জেলার সাহেব বলতেন, 'জেল তো বিশ্বনাথ চালায়, জেলার সাহেব জেল চালায় না।' সব কিছু আমাকে চালাতে হত। উৎসব অনুষ্ঠান, রিসেপশন সব কিছুতেই আমি ছিলাম। কেস-টেবিলের দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতা আছে। ভেতরে থাকাকালীন প্রতিদিন পুজো করতাম। মেডিটেশন তো ছিল। বনগাঁ জেলে প্রচুর গরু পাচারকারী আসত। সীমান্ত পেরিয়ে আসা লোকের ভিড়। কেস টেবিলে এ সব আমাকে দেখতে হত। খাতা-কলমের কাজ করতাম।

ভেতরের সঙ্গে বাইরের ফারাক আসমান জমিনের মতো। বাইরের জীবনটা মুক্ত জীবন, কিন্তু ভেতরের জীবনের মতো ভাল লাগা নেই।

কে কি বলবে জানি না, আমার তো এটাই মনে হয়েছে। বাইরে থাকলে বৃত্তের মধ্যে ঘুরতাম। ক'টা নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হত? ভেতরের লোকজন একেবারে আলাদা জগতের। নতুন নতুন আবিষ্কার, বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কত রকম মানুষ, তা বলে বোঝানো যায় না। একদল আসে, কেউ থেকে যায়। কেউ চলে যায়। আবার পুরনো দল যেতে না যেতে নতুন একদল মানুষের ভিড় জমে যায়। তার ভেতর থেকে জীবনকে খুঁজে পাওয়া, জীবনকে দেখতে পাওয়া, কম কথা নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুকুমার সুকোমল বৃত্তি আছে। সে যত বড় অপরাধীই হোক না কেন, তার একটা সফট কর্নার থাকবে। ওখানে থাকতে থাকতেই সেটা খুঁজে পাওয়ার কৌশল জেনে গিয়েছিলাম।

মানুষকে খুঁজে পাওয়ার নেশা জন্মে গিয়েছিল। বাইরের জীবনে সেটা পাইনি। দশ বছর ভেতরে থাকার পর বাড়ি ফিরলাম বটে, কেউ তো খোঁজ নিল না। অনেকে অপরাধীর ছায়া দেখে দূরে সরে গেছে। কেউ এড়িয়ে গেছে। তার পরেও তো বেঁচে থাকতে হয়েছে। সত্যটা তো কেউ তলিয়ে দেখল না। কিন্তু ভেতর থেকে বাইরে আসার জন্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে, ভেতরের লোকগুলো। ওদের পকেটের টাকা দিয়ে আমাকে জামিন করিয়েছে। বাইরে এসে ছেলেমেয়েকে ফিরে পেলাম। সংসারটা নিজের দু'হাতে ছুঁয়ে দেখবার অধিকার পেলাম। বাইরের পৃথিবীতে সংসার সত্য। সে কখনও ত্যাগ দেয়নি। বাকি সব মিথ্যে, ফিরে এসেই তো দেখলাম।

অবশেষ: আপনি একজন কবি ও সম্পাদক, দশটা বছর তো কম নয়। লেখালেখির কী হল?

কবি বিশ্বনাথ: সারাজীবন ধরে কতটুকুই বা লিখতে পেরেছি। লেখালেখির ছত্রিশ বছর কেটেছে বাইরে। আর দশ বছর কেটেছে জেলপাড়ায়। ওই দশ বছর

যা লিখেছি, তার এক ভাগ লেখাও ছত্রিশ বছর ধরে আমি লিখতে পারিনি। কারামন্ত্রী, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডি.আই.জি, আই.জি, ওয়েলফেয়ার অফিসার প্রমুখ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আমার লেখালেখির জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, সবই ওখান থেকে দেওয়া হবে। এমনকি ছবি আঁকার সমস্ত সরঞ্জামও আমি ওখান থেকে সব সময় পেয়েছি। তাঁদের মহানুভবতায় আমি আজও অভিভূত। আমার হাতের লেখার উচ্চ প্রশংসা কারাদপ্তরের সবাই করেছেন। ভেতরে থেকে যথেষ্ট মান-মর্যাদা পেয়েছি। বাইরের জীবনে যতটা ফতুর হয়েছি, ভেতরের জীবনে ততটাই সমৃদ্ধ হয়েছি।

ভেতরে থাকাকালীন একটা পত্রিকার সঙ্গেও গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম। কবি কানাইলাল জানা (তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক) এই পত্রিকার প্রশাসনিক সম্পাদক ছিলেন। একযোগে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলেই এটি পৌঁছে যেত। এই পত্রিকার উৎসভূমি ছিল দমদম সেন্ট্রাল জেল। পত্রিকাটির নাম ছিল ‘নবার্ক’। প্রধানত সাহিত্য পত্রিকা। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনের নানা ইতিহাস এই পত্রিকার পাতায় পাতায় উঠে আসত। জেলের কত রকম ইতিহাস যে ছাপা হয়েছে, তার ঠিক নেই। বিচারাধীন আসামী হলেও জেলর সাহেব আমাকে সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই পত্রিকার কারণে সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেল থেকে অজস্র চিঠিচাপাঠি আসত। প্রশংসায় ভরে থাকত সেই চিঠির পাতা। কখনও মনে হয়নি ভেতরে আছি, শুধু মনে হয়েছে লেখার জন্য ঈশ্বর আমাকে আটকে রেখেছেন। ভেতরে ছিলাম বলে ‘এখন খোলা হাওয়া’ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ‘নবার্ক’ ছিল আমার বেঁচে থাকার অন্যতম অক্সিজেন। একটানা তিন বছর প্রকাশ পেয়েছিল। তার পর কি হয়েছে জানি না, আমি তো বাইরে। জেলে বসে ‘খোলা হাওয়া’র একটা সংখ্যা অবশ্য তৈরি করেছিলাম। ওটা বনগাঁ উপসংশোধনাগারে থাকাকালীন। অন্যতম উৎসাহী ছিলেন সুখেন সাহা।

অবশেষ: জেলখানা তো অপরাধীদের সংশোধনাগার, তবু নিরপরাধও কখনও সেখানে ঢুকে পড়ে। গল্প, উপন্যাসে আমরা কত দেখেছি। জেলের মধ্যে অপরাধ কি একদমই হয় না?

কবি বিশ্বনাথ: ওই রকম অনেক ঘটনার মুখোমুখি আমরা হয়েছি। সে সব বলে লাভ নেই। ভেঙেচুরে দেওয়া, টাঙিয়ে দেওয়া, ফাটিয়ে দেওয়া অনেক কিছুই দেখতে হয়েছে। বিচারাধীন আসামিদের উৎপাত সবচেয়ে বেশি। ওরা

তো লাথখোর, মাতাল, জুয়াখোর। এমনও হয়, অনেকের বাড়ি থেকে পুলিশকে টাকা দিয়ে ভেতরে রেখে দেয়। যাতে বেল না পায়। ওদের ভেতরে রাখতে পারলে পরিবারের ভাল, ওদেরও মঙ্গল। অধিকাংশ অভিজাত ঘরের ছেলেরাই নেশাগ্রস্ত। কত রকম ব্যাপারস্যাপার। কত আর বলি।

অবশেষ: জেলের ভেতরে নেশার জিনিস ওরা পাবে কোথায়? আর জুয়া খেলার বিষয়টা একটু বলুন।

কবি বিশ্বনাথ: প্রত্যেক জেল ওয়ার্ডে একজন করে মেট আর রাইটার থাকে। ওরাই সব কিছুর ব্যবস্থা করে। গাঁজা তো বস্তা বস্তা ঢুকে যায় ভেতরে। বিড়ি-সিগারেটে ছাড় আছে। প্রকাশ্যে চলে। পূজা-পার্বণে চোখের আড়ালে মদ ঢুকে যায়। গাঁজা না থাকলে জেল থাকবে না। হেরোইনের নেশায় বাইরে অনেকে বুঁদ হয়ে থাকত। তারা তো জেলের ভেতর ও সব পায় না। ফলে সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে গাঁজা রমরমিয়ে চলে। এই নেশার দাবি যারা সামলায়, তারা সন্তর্পণে কাজ করে। ধরা পরলে তাদেরও জরিমানা হয়, সাসপেন্ড হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ট্রান্সফার হতে হয়। ভেতরে মোবাইল (মুঠোফোন) পুরোপুরি নিষিদ্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও জেলের ভেতর হাজার হাজার মুঠোফোন ঢুকে যায় চোরাপথে। টাকা দিলে ওখানে সব পাওয়া যায়। বাড়ির লোক অনেক সময়ে হাতখরচের জন্য মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে যায়, সেই টাকাও ওদের হাতে ঠিক পৌঁছে যায়। যে পৌঁছে দেয়, তার জন্যও মোটা কমিশন বরাদ্দ থাকে। আর জেলের ভেতর কিছু লাটসাহেব আসে, তাদের গা-পিঠ সব সময় ব্যথা থাকে। গেটে পয়সাও থাকে। জেলের লাথখোর বন্দিরা পয়সার জন্য তাদের জামাই-আদরে রাখে। গা-হাত-পা ম্যাসেজ করে, নানা কায়দায় দলে দেয়। দলাইমলাই না করলে তাদের তোয়াজের ভাবটা আসে না। তাদের খাবারদাবার সবই রাজকীয়। এক একজনের হাতখরচ মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা কিংবা তারও বেশি।

জেলের ভেতর প্রতিদিন জুয়া চলে। সন্ধেবেলা লকআপের পর জুয়া শুরু হয়। আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জুয়া তো হবেই, বিশেষ করে কালীপুজো আর দুর্গাপুজোর ক'দিন রমরমিয়ে জুয়া চলে। লাখ লাখ টাকার জুয়া। লুডো, ক্যারাম, তাস এগুলো দিয়েই জুয়ার আসর চলে।

অবশেষ: বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে নেশা তাহলে মধ্যমণি। কবিতার নেশা হাতেগোনা দু'-একজনের। তার বাইরে আর কী কী আছে?

কবি বিশ্বনাথ: বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলো আছে। বছরে তিনবার বিচিত্রানুষ্ঠান

হয়। পূর্ণদাস বাউল, সনজিৎ মণ্ডল, বাংলা ব্যান্ড 'ভূমি'র সুরজিৎ এ রকম অনেককেই আসতে দেখেছি। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যাতায়াত আছে। যারা অসমর্থ, তাদের জন্য ওরা বিশেষ কেয়ার নিয়ে থাকে। দমদম সেন্ট্রাল জেলের পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর। বর্ষার সময় এক রকম ছবি, শরৎ এলে জেলের পরিবেশে উৎসবের গন্ধ ছড়িয়ে থাকে, শীতের পরিবেশ আবার অন্য রকম। বহু বিঘা জায়গা জুড়ে দমদম সেন্ট্রাল জেল। জায়গাটা তো কম নয়। ফুলের সিজনে চারদিক ফুলে ফুলে ভরে যায়। প্রচুর ফলের গাছ আছে। শাকসবজির চাষও হয়। ভেতরে চার-পাঁচটা মন্দির আছে। নিয়মিত পূজার্চনা হয়। ভেতরে তিন হাজারের বেশি বন্দি থাকে। জেল দেখাশোনার জন্যে হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন ওয়ার্ডার থাকে। ওদের সঙ্গে বন্দিদের সম্পর্ক খুবই ভাল। ওরা বন্দিদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল।

অরুণেশ: দশ বছরের বন্দিজীবনে প্রিয় সঙ্গীসাথী কারা? তাদের সাথে এখন যোগাযোগ কেমন?

কবি বিশ্বনাথ: ভেতরের দিনগুলোতে আমার সবচেয়ে বড় সঙ্গী ছিল খাতা আর পেন। এর বাইরে মেডিসিন সেন্টারে আমার অনেকটা সময় কেটে যেত। তার পরেও কয়েক জন বন্ধুর কথা এখনও খুব মনে পড়ে। সুবীর, মর্দি, হেমাংশু, দীপঙ্করের কথা ভোলা যায় না। জেলর সাহেবের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সিকিউরিটি জেলর সাহেবের কোয়ার্টারে গিয়ে ভাত খেতে যাওয়ার স্মৃতি এখনও বেঁচে আছে। তিনি এই হাতঘড়িটাও আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। ওয়ার্ডারদের মধ্যে স্বপন ভদ্র ও তরুণ মণ্ডলের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। পরিবারে ফিরে আসার পরেও তাদের অভাব অনুভব করি। জেল তো একটা রাষ্ট্রের মতো, একবার বেরিয়ে এলে জীবন থেকে বহু দূর মনে হয়। আর ভেতরে ঢুকে থাকলে ওটাই একটা জগতে পরিণত হয়। এই মস্ত বড় জগতটাও তখন অন্য একটা পৃথিবীর সীমানায় চলে যায়। হাত বাড়ালেও আর ধরা ছোঁয়া যায় না।

অরুণেশ: ভেতরে দীর্ঘ দশটা বছরের অজস্র টুকরো টুকরো স্মৃতি। তার মধ্যে সেরা স্মৃতি কোনটা?

কবি বিশ্বনাথ: উনিশে নভেম্বর প্রতিবছর প্রেসিডেন্সি সেন্ট্রাল জেলে 'শহিদ দিবস' পালন করা হয়। একজন কবি হিসেবে সেখানে কয়েক বছর আমন্ত্রিত হয়ে গেছি, দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে। ওখানে কবিতা পাঠ করতাম। এই প্রতিনিধিত্ব করার একটা গৌরব আমি অনুভব করতাম। এটাই আমার কাছে

সবচেয়ে ঝকঝকে স্মৃতি।

অবশেষ: আর ফ্যাকাশে কোনও স্মৃতি আছে?

কবি বিশ্বনাথ: মিস্ত্রিদা ভীষণ গুণী মানুষ ছিলেন। জাত শিল্পী। দোতারা, বাঁশি চমৎকার বাজাতেন। ভাটিয়ালি গান তার কণ্ঠে হাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াত। তিনি সবার কাছে বড় প্রিয় ছিলেন। তিনি যে ৩০২ ধারার আসামি হতে পারেন এটা সকলের কল্পনার বাইরে ছিল। তিনি মানুষটা রূপকথার মতোই ছিলেন। অসীম সাহারার বুকে তিনি ছিলেন আমার মরূদ্যান। অনেকের আশ্রয়। ভেতরে থাকতে থাকতেই মিস্ত্রিদার ব্রেন টিউমার ধরা পড়ল। তিনি মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যু আমাকে ভীষণ নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি আমার জন্মান্তরের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন।

অবশেষ: জেলখানাকে ইউনিভার্সিটি বলা হয়, কথাটা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আপনার কী মতামত ?

কবি বিশ্বনাথ: আমার ধারণা, জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষক হল জীবনমন্থন করার অভিজ্ঞতা। জেলখানা হল সেই অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারঘর। পরিবারের বাইরে থেকে ছিন্নমূল জীবন কিভাবে নতুন করে নতুন কোনও দ্বীপের সন্ধান পাবে, তার পরিমিতি ও জ্যামিতি জেলখানার প্রত্যেকটা দেওয়ালে অদৃশ্যভাবে লেখা থাকে। যারা সেখানে পৌঁছয়, সেই দেওয়ালগুলো বইয়ের পাতার মতো পড়তে পড়তে যাবজ্জীবন কেটে যায়। মাস, বছর ফুরোয়। মিস্ত্রিদার মতো অনেকের জীবনও চলে যায়। বটবৃক্ষের মাথায় পশ্চিমের রোদ এসে দাঁড়ায়। তার পরেও জীবন কোলাহল করে ওঠে। সে জন্যেই জেলখানাকে বিশ্ববিদ্যালয় ভাবা যায়।

অবশেষ: জেলের ইতিহাস তো অনেক, দশ বছরে কতটা পড়লেন? আর কতটাই বা জানলেন?

কবি বিশ্বনাথ: মুখে মুখে কত ইতিহাস ঘুরে বেড়ায়। কতক সত্য, কতক মিথ্যে। স্বাধীনতার আমলের অনেক গল্প শুনেছি, ভেতরে থাকতে থাকতে। অকথ্য অত্যাচার চলত, শুনেছি। মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা তো ভয়ঙ্কর রকম অমানবিক। রাজ্যের বিভিন্ন জেলে পরাধীন ভারতবর্ষে সেই অত্যাচার চলত। আর ও সব বাদ দিয়ে জেলখানা হল ইতিহাসের আঁতুড়ঘর। ওখানে অজস্র ধারায় ইতিহাস প্রবাহিত। চোখের জল ধরে রাখা মুশকিল হবে।

অবশেষ: জেলে বিলাসিতা বলে কিছু আছে?

কবি বিশ্বনাথ: নেশার বিলাসিতা কিংবা জুয়ার বিলাসিতা আছে। বড়লোকের

বকে যাওয়া ছেলেদের খরচের বিলাসিতা আছে। তাদের মাসিক খরচের কোনও বাপ-মা নেই। তাদের পুরো জীবনটাই খরচের।

অবশেষ: ভেতরে থাকাকালীন এমন কিছু দেখেছেন, যা অনেকে দেখেনি?

কবি বিশ্বনাথ : পাগলদের ওয়ার্ডে অমানবিক অনেক দৃশ্য চোখে পড়েছে। ওরা সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ওদের জন্যে বরাদ্দ ছিল, কিন্তু পেত না। তবে বিপ্লববাবু সুপারিনটেন্ডেন্ট হয়ে আসার পর কোনও বিভাজন ছিল না। মানবতার হাওয়া বয়ে গেছে দমদমে। এখন তো শুনি, সব জায়গাতেই সুন্দর ব্যবস্থা। মানবিক প্রশাসন।

জেলের মধ্যে অনেক কদর্য ব্যবহারও চোখে পড়েছে, যা কখনও ভোলা যায় না। আতঙ্কের মনে হয়। জেল আমার চোখে সত্যিই আজ সংশোধনাগার হয়ে উঠেছে। উন্নত সংশোধনাগার। তবে সেই সময় মনে হত সংশোধনাগার নাম দেওয়াটা একটা ঠাট্টা। কারণ সংশোধনাগারের নিজেরই তখন কত কিছু সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। এখনও হয়তো সেই সব সংশোধনের মধ্যে কিছু বাকি থাকলেও থাকতে পারে!

অবশেষ: ওখানে লেখাপড়া করার সুযোগ কতটা? আর কি কি শেখা যায় ?

কবি বিশ্বনাথ: অনেটাই। ভেতরে ছোটদের স্কুল আছে। সাজাপ্রাপ্ত কিংবা বিচারাধীন বন্দিদের নাবালক ছেলেমেয়েদের জন্য। বিশেষ করে ফিমেল ওয়ার্ডে ছোটদের পড়াশোনার জন্যে চমৎকার ব্যবস্থা আছে। ওই স্কুলে মাঝেমধ্যে আমি ক্লাস নিতাম। অফিশিয়ালি আমি রিক্রুটেড ছিলাম না। আমি বিচারাধীন হওয়ার কারণে রিক্রুটেড হতে পারিনি। কিন্তু কখনও পরিবর্ত শিক্ষক হিসাবে আমি দায়িত্ব পালন করেছি। ভেতরে কেউ আমাকে নাম ধরত না। সবাই বলত মাস্টারদা। শুধু পড়ানো নয়, আঁকা ও আবৃত্তির ক্লাস নিয়মিত করতাম। ছোটরা নিয়ম করে আমার কাছে শিখতে আসত। আমি নিজে কম্পিউটার শেখার আবেদন করায় কম্পিউটার এসে গিয়েছিল। শিখতে শুরু করেছিলাম আমরা অনেকেই। তার পর তো চলে এলাম। ঠিকমতো কম্পিউটার শেখা হল না।

অবশেষ: জুভেনাইল সেকশনের কোনও বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছেন কি? মানে টুকরো কোনও অভিজ্ঞতা?

কবি বিশ্বনাথ: একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। যারা নিতান্ত বাপ-মা ছাড়া থাকতে পারে না, কেবল তারাই ফিমেল ওয়ার্ডে থাকতে পারত। আমি আসগার নামে (৭) একটি ছেলেকে পেয়েছি, যাকে আমি পড়াতাম। তাদের পরিবারের

আট-নয় জনের সাজা হয়েছিল, কিন্তু পরিবারে কোনও মেয়ে না থাকায় তারা জেল কর্তৃপক্ষকে আবেদন করেছিল, আসগারকে কাছে রাখার জন্য। যদি কাছে রাখতে না পারে, তা হলে জুভেনাইল সেকশনের নিয়মে তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আসগারের জন্যে যে আবেদন করা হয়, কর্তৃপক্ষ তা মঞ্জুর করেছিল। তাই সে তার আব্বা-চাচাদের সঙ্গে থাকবার সুযোগ পেয়েছিল। একমাত্র ওকেই জেলের ভেতরে আমি প্রতিদিন পড়াতাম। যখন বেরিয়ে এলাম তখন ওর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শেষ। বি.এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে।

অবশেষ: জেলের মধ্যে পড়াশোনা, পরীক্ষা ব্যবস্থা, রেজাল্ট, পাশ করা, ডিগ্রি লাভ বিষয়গুলো ঠিক কেমন?

কবি বিশ্বনাথ: বাইরে থেকে লোক এসে পরীক্ষা নিয়ে যায়। পর্ষদের কিংবা সংসদের পক্ষ থেকে সব ব্যবস্থা আছে। ওই রেজাল্টের গুরুত্ব কিংবা ডিগ্রি লাভের গুরুত্ব একদমই সমান। সবই সরকারি ব্যাপার। হাতে হাতে সার্টিফিকেট পেয়ে যায়। অনেককেই অসাধারণ রেজাল্ট করতে দেখেছি।

অবশেষ: আপনি কর্তৃপক্ষের কাছে কতটা বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন?

কবি বিশ্বনাথ: আমার হাতের লেখার তারিফ গোটা দমদম সংশোধনাগার জুড়েই ছিল। ভেতরের একাধিক ঘরে আমার আঁকা ছবি এখনও থাকলেও থাকতে পারে। তখন তো সব ঘরেই আমার ছবি ছিল। ভেতরে এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর এবং সেল এই চারটে সেকশন আছে। বিচারাধীন বন্দীদের জন্য দুই নম্বর বাড়ি নির্দিষ্ট। এক নম্বর বাড়ি সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের জন্য। আর তিন নম্বর বাড়ি হসপিটাল ওয়ার্ড। জেলের চিকিৎসাধীন যে কারও জন্য। আর সেল হল বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য। যারা এ ওয়ান, তাদের জন্য। একবার হল কি দুই বাই ছয় (২/৬) নম্বরের মেঝেতে ফাটল ধরেছে। ওটা খুব প্রাচীন বিল্ডিং ছিল। যখন ওটা রিপেয়ারিং করার জন্য আরও বেশি ভাঙাচোরা হল, তখন ওখান থেকে অজস্র মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে বলে কানাঘুষো হল। অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, ওখানে এত মানুষের মাথা এল কোথা থেকে। আসলে ও সব পরাধীন ভারতবর্ষের বন্দিদের মাথার খুলি। ইংরেজদের শিকার। কেউ কেউ আবার উল্টো কথাও বলছিল।

অবশেষ: জেলে দশ বছরে কখনও ভূতের দেখা পেয়েছিলেন কি ?

কবি বিশ্বনাথ: জেলখানায় ভূত নিয়ে বিভিন্ন মিথ আছে। প্রচুর গল্প ঘুরে বেড়ায়। কিছু নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত হয়ে আছে, ওই বাহান্ন বিঘার মধ্যেই। যেখানে

সচরাচর কেউ যেত না। যারা বেশি সাহস দেখাতে গেছে, ঠকেও গিয়েছে। বাবার নাম ভুলে গেছে। হঠাৎ করে কোনও ঝড় নেই, কিছু নেই, হঠাৎই কোত্থেকে একটা মোটা ডাল ভেঙে পড়ল। এ সবই স্বচক্ষে দেখেছি। পরবর্তী কালে কর্তৃপক্ষ সেই গাছ কেটে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। হসপিটাল ওয়ার্ডের নীচের ঘরগুলো ভূতুড়ে। এক নম্বর বাড়ির নীচের ঘরগুলোও ভূতুড়ে। ভূতের ঝামেলা ওখানে নানা রকম। তবে আইনের ভূতের চেয়ে বড় ভূত কিছু নেই। কত জ্ঞানীগুণী মানুষকে দেখেছি, আইনের ভূতে ধরেছে। সারাজীবন সে আর ছাড় পায়নি।

অবশেষ: এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে কোনও বার্তা দিতে চান কি ?

কবি বিশ্বনাথ: জগতে সবাই আমরা ভালবাসা চাই। ঘৃণা, উপেক্ষা এগুলো হজম করার জিনিস নয়। সবাই ভালবাসা ও আশ্রয় চাই। অপরাধীদের যে চোখে দেখা হয়, সেটা ঠিক নয়। জেলখানা হয়ে গেছে সংশোধনাগার। অপরাধীদের প্রতি সকলের পুরনো ধারণা আজ বদলে ফেলতে হবে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। কারণ, একজন অপরাধী কোনও না কোনও পরিবার থেকে এসেছেন। তিনিও একজন মানুষ। আর অনেক সময় সমাজের বানিয়ে তোলা মিথ্যে অপরাধীকে সমাজের মানুষই সন্দেহ করে, অবিশ্বাস করে। প্রকৃত অপরাধী লাটসাহেবের মতো ঘুরে বেড়ায়। আইনের ভূত তাকে ধরে না। কেননা, সে নামকরা ওঝার তাবিজ পরে আছে।

অবশেষ: অনেক ধন্যবাদ। ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। খুব ভাল লাগল।

কবি বিশ্বনাথ: আপনাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ। নমস্কার।

Ajker Gangchil Patrika • Volume 2 • Issue 6 • June–September 2022, Kolkata RNI
Title Code WBBEN 15820 • Declaration No. 06/2021, dated 07.03.2020, Rs.350.00

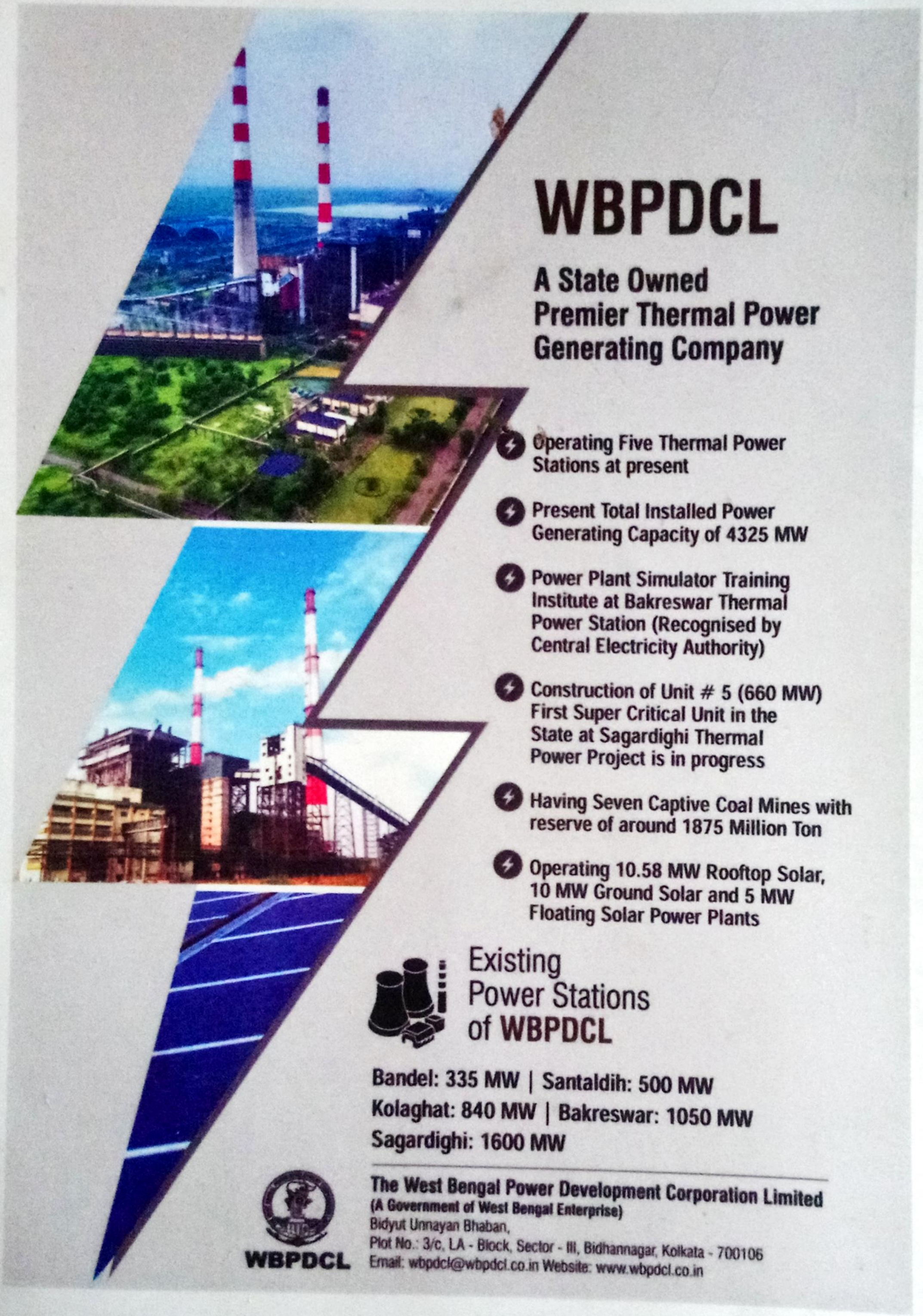

সম্পাদক, মুদ্রক এবং প্রকাশক: অধীর বিশ্বাস • ১৮/এ, টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং এস পি কমিউনিকেশন ৩১/বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত